সুবোধ দাশগুপ্ত

দাঙ্গা, নির্বাসিত জীবন ও মুখের মিছিল

১৯৪৫ সালের শেষে, মিত্রশক্তির সৈন্যরা যে যার ঘরে ফিরছে। আমরা তখন সবে ক্লাসের ফাইনাল দিয়েছি, অফুরন্ত অবসর। অন্তত মাসখানেকের জন্যে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, যার বাংলা তর্জমা এই রকম হতে পারে। 'আলসে মাথা, খুনীর কারখানা'। তখন অভিভাবকদের শিথিল শাসন। আমাদের অফুরন্ত আড্ডা আর মনে মনে কাল্পনিক যুদ্ধের মহড়া। 'দাঙ্গা'-র 'স্ট্র্যাটেজি' কষা।

আমাদের উত্তর কলকাতার দমদম অঞ্চল তখন মফঃস্বল। শ্যামবাজার গেলে তখন বলতাম 'কলকাতা'য় যাচ্ছি'। কলকাতার লোকদের দেখলে আমরা মফস্বলী হীনমন্যতায় ভুগতাম।

আমাদের অঞ্চলটা ছিল মুসলমান-প্রধান। আকাশে বাতাসে যখন তখন স্লোগান-যুদ্ধ। একদিকে 'বন্দেমাতরম্' অন্যদিকে 'আল্লা হো আকবর'। আমাদের গায়ে কাঁটা দিত। 'কী হয়' 'কী হয়' হাওয়া। সারাদিন উত্তেজনায় থাকা, রাতে পাহারা দেওয়া।

তখন বাবা মোটামুটি হিন্দু মহাসভার' সমর্থক। তার কারণ একটাই আমার বোধে আসে। সেটা হল, আমার পিতামহ স্যার আশুতোষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত নেতা শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে সেই সূত্রে যোগাযোগ। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি বাবা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এ সবই শোনা কথা। আমার কৈশোরে অনেকবার বাবাকে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দেখেছি।

একবার আমিও ভবানীপুরের বাসায় ওনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। নেহাৎই পারিবারিক কারণে। এখানে সে প্রসঙ্গ অবান্তর। এদিকে পাড়ায় যুদ্ধপূর্ব প্রস্তুতি চলছে। যে দিক থেকে যে পারছে অস্ত্র সংগ্রহ করে যাচ্ছে। আজকের আতঙ্কবাদীর কাছে 'প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্র' সে গুলো। লাঠি, সোঁটা, গুপ্তি ইত্যাদি।

এই 'গুপ্তি' প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে।

বিকেলে আমরা চারপাঁচজন মাঠে বসে গভীর গুলতানিতে ব্যস্ত, এমন সময়, আমাদের এক বন্ধু, কানাই, হন্ত-দন্ত হয়ে এল। হাতে একটা সরু বাঁশের নল যার দুদিক আটকানো। ওপরে একটা টিনের মুখটি দেওয়া। হাতখানেক লম্বা হবে। ওটা দেখিয়ে কানাই বলল, 'এটা কী বলতো?' আমরা সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখতে লাগলাম। ওই বাঁশের নলটা থেকে লম্বা চক্‌চকে শিক বের করল। যার মাথাটা ছুঁচোলো। কানাইয়ের 'ক্যালি' দেখে আমরা অভিভূত।

'—এই মোক্ষম অস্ত্রটা কোথায় পেলি?' আমরা জিজ্ঞাসা করলাম।

'—বলব কেন?' বলে রহস্য ভাঙল, আরে, যাদের জন্যে এ অস্ত্র তৈরি তাদেরই একজনকে দিয়ে বানিয়েছি।

আমরা চোখ বড় বড় করে দেখছি।

'—আরে লুকু মিয়া রে, আমরা যাকে 'লুকু কামার' বলি। ও যে কী করেছে ও নিজেই জানে না।'

'যার শীল যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া' আর কি!

আমরা বললাম, 'এ রকম কতগুনো?'

'—সে তোদের ভাবতে হবে না।'

কানাইয়ের দৌলতে আমরা সবাই একটা করে পেয়েছিলাম। ওটা পেয়ে আমাদের আপাত সাহস বেড়েছিল বটে কিন্তু স্বস্তি ছিল না। ওটাকে বাড়িতে নিরাপদ স্থানে রাখাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে অভিভাবকদের

চোখ এড়িয়ে। অস্ত্রপ্রয়োগে অনভিজ্ঞতা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। নানা আতঙ্ক আর সত্যিমিথ্যে সংবাদ খবরের কাগজ, বেতার মারফতে আমাদের বিচলিত করছে। প্রায় রাতারাতি ঘরের দাও, কুড়োল, বঁটি শান দেওয়া চলছে। অনেক বর্শার ফলা, লাঠি সংগ্রহ চলছে আর সেই 'মোক্ষম অস্ত্র' কানাইয়ের দৌলতে সংগ্রহ হয়েছে ইতিমধ্যেই। প্রত্যেক বাড়ির ছাদে বস্তা বস্তা রাস্তার ইঁট-পাটকেল, পাথুরে খোয়া জড়ো করা চলছে। অভিভাবকদের মধ্যে যাঁরা এসব পছন্দ করতেন না শেষ পর্যন্ত সায় দিলেন। এদিকে দেখছি খোলা 'তরোয়াল' নিয়ে অচেনা মুসলমান ছেলেরা রাস্তায় দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর 'নাড়া' লাগাচ্ছে 'আল্লা-হো-আকবর'। আমরাও ছেড়ে কথা কইছি না। দল বেঁধে বেরিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিতে দিতে 'গুপ্তি' হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বাড়ির মেয়েরা একসঙ্গে শাঁখ বাজিয়ে পরিবেশকে ভয়াবহ করে তুলছে। পরক্ষণে দেখি রাস্তা পরিষ্কার। ওরা পালানোর সময় আমাদের হাতের 'এক হাতি'টাকে সন্দেহের চোখে দেখতে দেখতে যেত। আমরা কখনও নল থেকে 'মোক্ষম অস্ত্র'টি বের করতাম না। কারণ তাতে কী বিপদ ডেকে আনে কে জানে ?

আমাদের পাড়া থেকে বড় রাস্তার মুখটাতে লুকু কামারের কামারশালা। একটা ঝুপড়ি ঘর। খোলার চালা। চালের ফুটো দিয়ে এখানে সেখানে সূর্যের আলো পড়ছে। ওখান থেকে বর্ষার জলও পড়ে। মাঝে মাঝে নিজেই সারিয়ে নেয়।

ঝুপড়ি ঘরে কাঠ কয়লার হাঁপরটানা উনুন, উত্তপ্ত লোহা ঠাণ্ডা করার জন্য উনুনের পাশে মাটিতে বসানো একটা গামলায় জল। গামলাটাও পোড়া মাটির। লুকু কামার লোহা পেটাই করে। পাশে একটা চাটাইয়ের মাচানে বসে কামারের 'বিবিজান' তামাক পাতা বেচে। অশিক্ষিত, গরিব কামার-পরিবারের মাথায় দাঙ্গার ঘোর-প্যাঁচ ঢোকে না। সামান্য পয়সার বিনিময়েই খুশি হয়ে কাজ করে দেয়। কেউ যদি তার উপর ওর কাজের প্রশংসা করে তো কথাই নেই।

কানাই ওর এই দুর্বলতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের কাজ উদ্ধার করেছিল। সরল সাদাসিধে, অশিক্ষিত লুকুর মাথায় কোন জটিলতা ছিল না। একমাথা শনের মতো কাঁচা-পাকা চুল। টিংটিঙে, কালো কুচকুচে রং। বিবিজানের চেহারা আরও এককাঠি সরেস। নীলচে ছেঁড়া-ফাটা তেনা গায়ে জড়ানো থাকত। ওই তেনার নীচে চামড়ায় ঢাকা কয়েকখানা হাড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

দুজনেই ছোট নলওয়ালা হুঁকো টানত। বিবি সারাদিন লুকুকে কাজের জোগান দিত আর চিটে গুড়মাখা তামাক, তামাকপাতা আর কাঠ কয়লা বেচত। ওদের কোন বাচ্চা কাচ্চা ছিল না। হাসি তার লেগেই থাকত। এ হেন মানুষ দুটো কার শত্রু হতে পারে? সন্দেহ করেনি কখনও কাউকে। ওর কোন কাজ যে ওরই মৃত্যুবাণ হতে পারে এ চিন্তার অবকাশ ছিল না লুকুর।

আমাদের প্রস্তুতির কোন ত্রুটি ছিল না। তবে আগবাড়িয়ে একটা খুনটুন করার মতো কোন বাসনা ছিল না। লুকুর মতো নিরীহ লোকটাকে সপরিবারে উৎখাত করা আমাদের কাছে কিছুই ছিল না, আমরা ওকে হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে কখনও ভাবতাম না। আমরাও যেমন সহজ চোখে দেখতাম, তেমনি

ও আমাদের দেখত। আমরা ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে চিন্তিত ছিলাম। এর বছর কয়েক পরে ওদের এক বিষাদময় পরিণতি ঘটে।

এদিকে সারা দেশে 'রণং দেহি' অবস্থা। সুবে বাংলার প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেব। তখন 'মুখ্যমন্ত্রী' বলে কিছু ছিল না।

সুরাবর্দি সাহেব তখন মুসলিম লিগের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। হিন্দু-বিদ্বেষী বক্তৃতায় মুসলমানদের উত্তেজিত করে চলেছেন। তাঁর বক্তব্য 'পাকিস্তান' হলেই তোমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের সব মুশকিল আসান হয়ে যাবে। মুশকিল আসান কতটা হয়েছিল জানা নেই।

মুসলিম লিগ 'কাফেরদের জব্দ করার জন্যে আনসার বাহিনী তৈরি করেছে। সবুজ কোর্তা পায়জামা পরা জঙ্গী বাহিনী সরকারি মদতে পাড়ায় পাড়ায় মার্চ করে আতঙ্ক ছড়িয়ে চলেছে।

এই রকম কোন দাঙ্গাজনিত আতঙ্ক ছড়ালেই পুরোন কিছু প্রভাবশালী স্থানীয় লোক পাড়ায় এসে হিন্দুদের নির্ভয়ে থাকতে উপদেশ দিতেন। আমরা থাকতে আপনাদের গায়ে কেউ আঁচড় দেবে না।

আপনারা ধৈর্য্য ধরে, শান্ত হয়ে থাকুন। এদের মধ্যে দুজনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। একজন ছন্নু মিয়া, যার একটা বিড়ি সিগারেটের দোকান ছিল। দোকানটি খুবই চলে। অনেক লোকজন ঐ দোকানে বিড়ি বাঁধার কাজ করত।

বাবা শেষের দিকে খুব বিড়ি খেতেন। পয়সা দিয়ে বলতেন, 'যা ছন্নুর দোকান থেকে বিড়ি নিয়ে আয়।' আমাদের সঙ্গে খুব জান-পহেচান ছিল।

'—হাঁ বেটা, বাবুকা হাল ক্যায়সা হ্যায় ?' আমাকে 'বেটা' বলতেন। বাবার তবিয়তের খারাপ হালের খবর রাখতেন। আমাদের বাড়ির সামনে একটা খোলা বারান্দা ছিল। তার সামনে রাস্তা পেরোলেই বেশ প্রশস্ত পুকুর। গরমকালে ওই বারান্দায় বসে থাকতে ভালই লাগত। অফিস ফেরত বয়স্করা এসে বসতেন। পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছার আদান-প্রদানের পর পারিবারিক সমাচার ও সমকালীন রাজনীতি, অফিস, বাজার দর ছিল আলোচনায় বিষয়বস্তু। মাঝে মাঝে তাসের আড্ডা বসত। মুড়ি আর চায়ের জোগানদারির কাজ ছিল মায়ের।

এই আড্ডায় ছন্নু মিয়া, মোক্তার হোসেনের মতো লোকও মাঝে মাঝে আসত। তার জন্য জাতপাতের তফাত বুঝতাম না। তফাতের মধ্যে এরা কেউই বাঙালি মুসলমান না।

মোক্তার হোসেন ছিলেন মিউনিসিপাল কমিশনার। মোটামুটি শিক্ষিত। ওঁর কাছে কেউ পৌর সংক্রান্ত নালিশ নিয়ে গেলে মুসলমান হিন্দু নির্বিশেষে সাহায্য করতেন। ওঁর একটা ইলেকট্রিকের দোকান ছিল। আমরা ওঁকে 'চাচা' বলতাম। ওঁর ছেলেটা আমাদের চেয়ে এক-দু ক্লাস নীচে পড়ত। আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে খেলাধুলো করত।

আমাদের ঘনিষ্ঠ বাঙালি মুসলমান বন্ধুরা কেউ 'নাড়া' দিত না বা 'খোলা তরোয়াল' নিয়ে আস্ফালনও করত না।

তবু নানা সূত্র থেকে এলোপাথারি সংবাদে বিচলিত হয়ে যেতাম।

পরস্পরকে সন্দেহের সূত্রপাত সেই থেকে। আমাদের মধ্যে পাকাপাকি পাঁচিল উঠে গেল। আজও আমরা সে পাঁচিল ভাঙতে পারলাম না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেমন কালোবাজারি, মাফিয়া ও দুর্ভিক্ষের জন্মদাতা তেমনি দাঙ্গার 'নেট রেজাল্ট' জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস, শূন্যতা ও মানবিকতার হত্যা।

আমাদের অঞ্চলে দাঙ্গার উত্তেজনা দুই তরফেই ছিল। তবে কাউকে খুন হতে দিই নি। অস্ত্রসজ্জা ছিল নেহাতই আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে। আমাদের ওই বয়সে অ্যাডভেঞ্চারের প্রবৃত্তি ছিল রক্তে, খুনের রক্ত কোন দিনই প্রবাহিত হয়নি ধমনীতে। এর কারণ আমাদের পরিমণ্ডল, শিক্ষা, গুরুজনদের আচরণ। সর্বোপরি কেরানিনন্দনের খুন করার বুকের পাটা থাকে না। ইংরাজ আমলে আমাদের 'কেরানিবাবু' বলে পরিচিতি ছিল।

আমার পৈত্রিক দেশ ছিল যশোরে। কবে আমরা দেশ ছেড়েছিলাম জানি না। অন্ততঃ বাবার কাছ থেকে কিছু শুনিনি। আমাদের চারপুরুষ কলকাতায় বসবাস।

শৈশব কেটেছে কালীঘাটে, দমদমে। তার আগে চেতলায়। ওখানকার কথা মনে নেই। হয়ত পৃথিবীর আলো তখনও দেখিনি বা দেখলেও স্মৃতিতে থাকার কথা নয়। ১৯৩৪ সালে দমদম আসি। সেই থেকেই আমাদের পারিবারিক বসবাস এখানেই।

তখন কাগজ ও বেতার মারফতে খুনোখুনির খবর আসছে। কলকাতার গলিতে গলিতে উত্তেজনা। নোয়াখালির মৃত্যু যজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেছে। গান্ধীজী স্বয়ং দাঙ্গা থামাতে দলবল নিয়ে সেখানে উপস্থিত। সেই সময় কলকাতায়ও আগুন। জ্বলছে কলাবাগান, রাজাবাজার, বেলেঘাটা, খিদিরপুর, পার্কসার্কাস।

আশ্চর্যের কথা, বস্তি এলাকায় দাঙ্গার প্রবণতা দেখা গেল বেশি। বীভৎস ছবি, বর্ণনা খবরের কাগজের পাতায় পাতায় বেরুচ্ছে। একএকটা খবর পড়ি বা শুনি, আমরা শিহরিত হই। এরপর বিহারের দাঙ্গা সব খবর স্তব্ধ করে দেয়।

১৯৪৬ সালের ১৪ই আগস্ট রাত বারোটায় তোপধ্বনি শোনা গেল। নেতাদের ভাবগম্ভীর বক্তৃতা। জনসাধারণকে সজাগ করে দেওয়া হল তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে। কেন দেশ ভাগ হল তার সাফাই গাওয়া হল।

এদিকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে দেশের কোণে-কোণে। কলকাতার সৎ নাগরিকেরা মিলে 'শান্তি কমিটি' গঠন করলেন। এরা উপদ্রুত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে শান্তির বাণী ছড়ালেন। কোথাও কোথাও সামান্য কাজ হল।

একদিন কাগজে বেরুল স্বাধীনতা সংগ্রামী ও একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী 'সুশীল দাশগুপ্ত' মহাশয় আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন। তখন তিনি 'শান্তি মিছিল'-এর পুরোভাগে ছিলেন। সেদিনই সরাসরি আগুনের আঁচ অনুভব করলাম। সুশীলবাবু আমাদের নিকট আত্মীয় ছিলেন। ছোটবেলায় বার দুই ওঁর বাড়ি গিয়েছিলাম। চেহারাটা চেনা ছিল।

ছোটবেলা থেকেই সিনেমা দেখার একটা প্রবণতা ছিল। বিশেষ করে হলিউডের ছবি। হলিউডের ছবিই বেশি আসত। ভাল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উপন্যাসের চিত্ররূপ হলে তো কথাই নেই। সেই সুবাদে অনেক ভাল ছবি দেখে ফেলেছি। একবার আগে থেকে না জেনে একটা হলে ঢুকে পড়ি।

খুব বোকা বনে গিয়েছিলাম। সে ছবির বিষয় ছিল একজন আমেরিকান 'কাউবয়'কে নিয়ে। যে বার রোনাল্ড রেগন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন আমি নাক সিঁটকিয়েছিলাম। সেই নৃশংস কাউবয়টিকেই শেষপর্যন্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট করা হল!

সিনেমা দেখার একটা রোমহর্ষক কাহিনী—

তখন ক্লাশ নাইন-টেনে আমাদের র‍্যাপিড রিডার ছিল চার্লস ডিকেন্সের সুবিখ্যাত উপন্যাস 'ডেভিড কপারফিল্ড'-এর স্কুল সংস্করণ। বইটা পড়তে গিয়ে একটা নতুন শব্দ শিখেছিলাম, শব্দটা ছিল 'পস্থুমাস'।

'হোয়েন আই ওয়াজ বর্ন, মাই ফাদার ডায়েড। আই ওয়াজ এ পস্থুমাস চাইল্ড।'

বইয়ের আরম্ভেই এই রকম একটা বর্ণনা ছিল। প্রথম যখন ক্লাশ টিচার শব্দটির মানে বলে দেন তখন সহানুভূতির সমস্তটাই ঐ 'ডেভিড'-এর ওপর পড়ল।

আহা, বেচারা বাবাকে দেখতে পেল না। সৎবাবাকে পছন্দ না হওয়ায় মা 'আন্টি' অর্থাৎ পিসির কাছে রেখে এলেন। সারা জীবন ডেভিড কত কষ্ট পেল। কাঠ-খোট্টা পিসির কাছেই মানুষ হতে হল।

সেদিন অন্যান্য দিনের মতো কাগজ দেখতে গিয়ে সিনেমার বিজ্ঞাপনের পাতায় দেখি 'ছায়া'সিনেমায় 'ডেভিড কপারফিল্ড' হচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, যেমন করেই হোক, আজই দেখতে হবে। সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়িতে বলে গেলাম, বেরুচ্ছি। আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে। শুনে মা আপত্তি করলেন। অনেক অনুনয়ের পর বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার কথা বলাতেই বরফ গলল। আমি 'মুক্ত বিহঙ্গ' হয়ে দুপুর বারোটা নাগাদ রওনা দিলাম। তখন কলকাতায় দাঙ্গার গরম হাওয়া তুঙ্গে। দমদমে সেটা আঁচ করা যায় নি। সঙ্গে কাউকে না নিয়েই 'যা হয় হবে' বলে রওনা দিলাম। শ্যামবাজার নেমে ভয় ভয় করতে লাগল। মানিকতলা পর্যন্ত 'যাব কি যাব না' দোটানায়। ভাবতে ভাবতে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট ধরে বিবেকানন্দ রোডের দিকে হাঁটতে লাগলাম। স্বাভাবিকের চেয়ে কম লোক চলাফেরা করছে। সবারই মুখে একটা আবছা আতঙ্কের ছাপ। আমিও দুদিক দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। বিবেকানন্দ রোডের কাছাকাছি পৌছতে একদঙ্গল আর্মড পুলিশের মধ্যে থেকে একজন পাহারাদার বলে উঠল 'কাঁহা যাওগে ?' 'যেখানে বাঘের ভয়—।' আমার সেদিন প্রথম স্টেজে ওঠার অবস্থা। হাঁটু দুটো শাসনে নেই। আমি খেই না পেয়ে সামনের একটা গলি দেখিয়ে দিলাম। পুলিশটা আর কিছু বলল না। বিবেকানন্দ রোড দিয়ে মানিকতলার কাছাকাছি যেতে আর এক বিপদ। পেছন থেকে এক ভদ্রলোক আমায় ডেকে বললেন, 'খোকা কোথায় যাচ্ছ ? রাস্তার ওপারে যেও না, বাগমারিতে চারজন খুন হয়েছে। এই সময়ে বাড়ি থেকে না বেরুলেই হত না ?' বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা মিলিটারী ট্রাক হুস্ করে বেরিয়ে গেল। তার ছাদ খোলা। পাঁচ-ছজন মিলিটারী, রাইফেল, টমি গান চারিদিকে তাক করা। 'পান থেকে চুন খসার' উপায় নেই।

বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। তবু এ ফুটপাথে অল্প লোকজন আছে। সাহস করে গুটি গুটি পায়ে 'ছায়া' সিনেমার গেটের কাছে গিয়ে দেখি এক ভোজপুরি দারোয়ান টুলের ওপর বসে। হাতে একটা লাঠি তবে আকারে ছোট। আমি এগিয়ে গিয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ শো বন্ধ ?' যেন চোরাই মাল পাচারের সংবাদ নিচ্ছি। কেউ শুনে ফেলল না তো ? চারিদিক দেখে নিলাম।

দারোয়ান আমার অবস্থা দেখে হেসে গেট একটু খুলে ভেতরে ঢুকতে বলল। আমার মনে হল যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে জেলখানার বাইরে, না ভেতরে ঢুকলাম। তবে গেটের ভেতরে ঢুকে স্বস্তি পেয়েছিলাম, এটা মনে আছে। প্রদর্শনী চত্বর একটু ভেতরে। আমার কাছাকাছি বয়সের কয়েকজন ছেলে, মনে হল নিকটস্থ কোন লোকালয় থেকে এসেছে। তাদের মুখে চোখে কোন উদ্বেগ নেই। তারা পরিবেশের সঙ্গে ধাতস্থ হয়ে যাওয়া বলেই মনে হল। হলের ভেতরে ঢুকে নিজের পছন্দমত সিটে বসে পড়লাম। সাড়ে চার আনার টিকিটটি লাইটম্যানদের কাছে দেখাতে একজন বলল, 'আজ যেখানে খুশি বসে পড়।'

হলের মধ্যে সর্বসাকুল্যে দশ থেকে বারোজন দর্শক। আমার প্রথমটায় গা ছমছম্ করছিল। ছবি আরম্ভ হতে সেই অবস্থা কেটে গেল। আড়াই ঘণ্টা 'ডেভিড'-এর জগতে ডুবে গেলাম। আমি তখন প্রায় 'ডেভিড', ইংল্যাণ্ডের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, কলকাতার কোন দুশ্চিন্তা নেই।

ছবি যখন শেষ হল প্রায় ছটা বাজে, গরমকাল দিনের আলো তখনও আছে। বেরিয়ে কোন দিক না তাকিয়ে 'ছায়া' সিনেমার দক্ষিণের একটা গলি দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। গলির মুখটায় আজকের পেট্রল পাম্প তখনও তৈরি হয়নি। মতলব, সদর রাস্তার গা ছমছম্ করা আবহাওয়া এড়ানো। মনে মনে ম্যাপ এঁকে নিয়েছিলাম, সোজা পশ্চিম দিকে গিয়ে তারপর উত্তরমুখো প্রথম গলি ধরে শ্যামবাজার মুখো হাঁটা দেব। গলির ভেতর বেশ খানিকটা বস্তি অঞ্চল। সেখানে বাচ্চারা ঘরের দাওয়া, রাস্তায় খেলাধুলা করছে। বউ, ঝি, ব্যাটাছেলেরা কাজকর্ম করছে। তবু প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে।

বস্তি থেকে তথাকথিত ভদ্র পাড়ায় পৌঁছতে উত্তরমুখো কোন গলি পাই না। ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে আসছে। হাঁটা আর থামে না। তখন কলকাতার গলিতে গ্যাস পোস্টে আলো জ্বলে। কোথায় আমার বাঞ্ছিত গলি। গলি আর পাই না। 'নিজের ছায়া দেখে ভয় পাওয়ার পরিবেশ। গ্যাস পোস্টের নীলচে আলোর সেই আলো-আঁধারির রোমান্স হারিয়ে গিয়ে এক ভয়াবহ চেহারা নিচ্ছে। জনপ্রাণী বলতে রাস্তার কুকুর ছাড়া একটা বেড়ালেরও দেখা মিলছে না। একটা বাঁকে এসে তারস্বরে কুকুরের ডাক শুনে থমকে দাঁড়াতেই দেখি, একটু দূরে একটা গ্যাস পোস্ট। তার টিমটিমে আলোয় ছায়ার মতো কুকুরগুলো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে আর এদিক ওদিক ছুটছে। আমি মরিয়া হয়ে কুকুর এড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি। যেতে যেতে শুধু দেখলাম দুটো মুখ বাঁধা বস্তা। গায়ে রক্তের ছাপ। আধা আলো আধা ছায়ায় যেন দুঃস্বপ্ন দেখলাম। যখন হুঁশ হল

দেখলাম, ঠন্‌ঠনে কালীবাড়ি। যেটা আমার জানা ছিল। দু এক জনকে চোখে পড়ল। ইতিমধ্যে ঠন্‌ঠন্ আওয়াজ তুলে একটা ট্রাম এসে দাঁড়াল। আমি যেন ধড়ে প্রাণ পেলাম। কোন দিকে না তাকিয়ে ট্রামে উঠে বসলাম। ও মা, দুজন দেখি আমার সঙ্গে উঠল। ওই মুখ বাঁধা বস্তা দুটো পিছু নিল না তো ? আমার সামনের সিটেই ওরা দুজন বসল। দেখে শুনে ওদের রকম-সকম ভাল লাগল না। আমি মরিয়া হয়ে রাস্তার দিকে দেখতে-দেখতে চললাম। ওদের দিকে টেরিয়ে দেখে মনে হল, একবার কী গুজুর গুজুর করছে আর আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছে। আমি আমার জানলার বাইরে দেখছি আর 'ঠন্‌ঠনে' মা'র নাম জপতে জপতে শ্যামবাজার খুঁজছি। যেন শ্যামবাজার দেখলেই জানলা দিয়ে লাফ দেব। গোটা ট্রামের কামরায় ওই দুজন ছাড়া আমি আর এক-দুজন যাত্রী।

প্রাণ হাতে করে বাড়ি ফিরলাম সেদিন। 'ডেভিড'-এর সত্তা তখন আমার থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তখন 'তিরিশ বি' বাস ভূপেন বসু এভেনিউর মুখ থেকে ছাড়ত। বাড়ি ফিরতে প্রায় আটটা বেজে গেছিল। বাবা ইদানীং রাস্তাঘাটের গণ্ডগোলের জন্য আটটার আগেই বাড়ি ফেরেন। সেদিন আরও আগে ফিরেছেন। মার সামনে যেতে ধমক খেলাম, 'এই তোমার তাড়াতাড়ি।'

১৯৪৮ সাল। একদিন আমরা পাঁচ বন্ধু মিলে স্থির করলাম বর্ডারে যাব। পাঁচজনের মধ্যে আমি, তরুণ, দীপক, বিষ্ণু আর কুশল। আমাদের সঙ্গে কানাইকে নেবার কথা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওকে অনেক ভেবে বাদ দিতে হয়। নিলে কখন কী করে বসে, কেউ জানে না। যা বদ্‌রাগী! থাকলে অবশ্য আমাদের সাহস বাড়ত। শেষ পর্যন্ত ইচ্ছে থাকলেও নেওয়া গেল না।

আমরা সামান্য কয়েকটা টাকা নিয়ে এক সোমবার ভোরে বেরিয়ে পড়লাম। মাকেও যথারীতি বুঝ দেওয়া গেল কোনমতে। বাবাও তখন কয়েকদিনের জন্য অফিসের কাজে বাইরে গেলেন। এই মোক্ষম সুযোগ হাতে পেয়ে কে ছাড়ে। আমাদের উদ্দেশ্য বর্ডার থেকে পূর্ব পুরুষদের ভিটে দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা।

আমি ছাড়া পূর্ব পুরুষদের ভিটে সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না আর কারও।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে ক'টায় কোন ট্রেন, আগের দিন জেনে এসেছিলাম। পরের দিন যথা সময়ে স্টেশনে পৌঁছলাম। তখন ট্রেনগুলোর রং ছিল সবুজ। কয়লার ইঞ্জিন। কামরার গায়ে 'ই, আই, আর' কথাটা লেখা থাকত। এখনকার মত ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ক্লাশ ছাড়াও ইণ্টার ক্লাশ ছিল। শাসক শ্রেণীর কী

বুদ্ধি! প্যাসেঞ্জারদের মধ্যেও তিনটে 'পাঁচিল' তুলে দিয়েছিল। ধনী মানে ফার্স্ট ক্লাশ, মধ্যবিত্তদের জন্য ইণ্টারক্লাশ আর গরীব শ্রেণীর জন্য থার্ড ক্লাশ। ভাড়াও এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল। আজকের দিনে ভাবাই যায় না। তবু সাধারণ মানুষ প্রয়োজন ছাড়া ট্রেনে চড়ত না। অনেকক্ষণ বাদে ট্রেন আসত। উদ্বাস্তুর চাপে কিছু ট্রেন বেড়েছে।

ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশন সংলগ্ন জমিতে উদ্বাস্তুরা ইতিমধ্যে ডেরা বেঁধেছে। এলোপাথারি জীবন। স্থায়ী আস্তানার এবং কাজের সুযোগের অপেক্ষায় আশায় বুক বাঁধছে। বরিশাল, খুলনা, ঢাকা, নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অ্যাকসেণ্ট-এ গালাগালি, ঝগড়াঝাঁটির শোরগোল। শুধু সুবিধাজনক আস্তানা দখলের কারণে। কেউ কারুকে চেনে না। সরকারি রিলিফ বাবুরা রিলিফ দিতে জেরবার। হুড়োহুড়ি সামলাতে পুলিশ হিম্‌সিম্‌। মানবিক কারণে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার হুকুম নেই। সাত সকালে জল নিয়ে মারামারি। লাইনের পাশেই মেয়ে পুরুষ লজ্জা সরম বিসর্জন দিয়ে প্রাতকৃত্য সারছে। পরনের কাপড় শতচ্ছিন্ন। যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের কল্পনার বাইরে।

হাত পা ওয়ালা মানুষের বিচিত্র পশু-জীবন। ওপারের নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তের মধ্যে কোন তফাত নেই। উচ্চবিত্ত সুবিধাভোগীরা যে কোন দুর্যোগে যোঝবার ক্ষমতা রাখেন, তাই তাঁরা এ বর্গে নেই।

আকস্মিকভাবে এক চিল-চিৎকারে আমাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের সম্বিৎ ফেরে। পেছন ফিরে দেখি দুটি শিশুর মধ্যে একটা কলা নিয়ে হনুমান-সুগ্রীবে লড়াই চলছে। দুটি শিশুই উলঙ্গ। কুশল (আমাদের বন্ধুদের একজন) ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

কুশল একটু নরম মনের মানুষ। ঘটনাটা এই রকম—বাচ্চাদুটোর চেহারা দেখে কুশল থাকতে না পেরে দুজনকে কাছাকাছি ফলওলার কাছ থেকে দুটো কলা কিনে দুজনের হাতে দেওয়ার জের এই ঘটনা। একজন, যে আরেকজনের চেয়ে শক্তপোক্ত সে শেষ পর্যন্ত দুটো কলাই উদরস্থ করে। আর একটা বাচ্চার প্ল্যাটফর্মে শুয়ে আথালি পাথালি চিৎকার। কুশল বোকা বনে গেছে।

আমি বললাম, 'তোর অত আদিখ্যেতা দেখানোর কী ছিল? মনুষ্য নয় তো, দয়ার সাগর ঈশ্বর চন্দর! এখন এখান থেকে সরে পড়ি চ, যদি বাঁচতে চাস্‌। বাচ্চাটা চেঁচাতে চেঁচাতে 'পটল তোলা'র এভ্‌রি চান্‌স। যদি সত্যি সত্যি তাই হয় আমাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না।' 'ফাঁসি কাঠে ঝোলার আগেই খেঁকুরে উদ্বাস্তুর দল আমাদের ছিঁড়ে খাবে' বিষ্ণু এই কথা বলে

কুশলকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ঐ বাচ্চাটার থেকে অনেক তফাতে গিয়ে দাঁড়াল। আমরাও ওদের অনুসরণ করলাম। কুশল তখনও ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছে।

তখনও রেল সম্পদ ভাগ করে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তোড়জোড় চলছে। জনসমুদ্রের এপার ওপার করতে দুই তরফের কর্তৃপক্ষ বেসামাল। অন্য দিকে মনোনিবেশ করার অবসর মিলছে না। কর্তব্যরত কর্মচারীরা ভাববে, এ কী ঝামেলা রে বাবা, খাল কেটে কুমির (দেশ ভাগ) ডেকে আনা। কেউ কেউ আবার মেওয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে। শেয়ালেরা শ্মশানেই ধন্ধবাজ হয় বেশি।

আমরা খুলনাগামী ট্রেনে উঠে পড়লাম শেষ পর্যন্ত। এটা আমার দ্বিতীয় পর্যায়ে খুলনাগামী ট্রেনে চড়া। আগের পর্ব উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে।

উনিশশো একচল্লিশ সাল কেটেছে দেওঘরের রামকৃষ্ণ মিশনে। সেই যেবার কবিগুরুর মহাপ্রয়াণ হয়েছিল। আমরা বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা দু-মিনিট নীরবতা পালন করেছিলাম। তখন শুধু জানতাম কোন বড়লোক মরে গেলে মিনিট দুয়েক গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকলেই হবে। আমার আগের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ। তিনি আকস্মিক ভাবে মারা গেলে সেদিনও আমরা শিক্ষকের নির্দেশে ঠিক দু মিনিটই মৌন ছিলাম। সব মৃত্যুরই এক দাম। শুধু রবি ঠাকুরের কবিতা থাকত বইয়ের পাতায় আর তাঁর লেখা গান শোনা যেত। তখন বুঝিনি, এখন বুঝি ভারতবর্ষের দু-শো বছর নীরব থাকা উচিত ছিল। অতবড় প্রতিভার মৃত্যুতে দু-মিনিট মাত্র ?

উনিশশো বেয়াল্লিশ সাল, আর এক দুর্যোগের বছর। ইতিহাসে রাজায় রাজায় 'ঢাল তরোয়ালের যুদ্ধ' আন্দাজ করতে পারি। বিমান, বোমা, কামানের যুদ্ধ শিয়রে। কেমন সে যুদ্ধ দেখতে ইচ্ছে করে বালকের চোখ দিয়ে। কীরকম ভাবে বলি, যেমন ধরুন, একটা জাপানী যুদ্ধ-বিমান টুক করে একটা বোমা ফেলবে আর আমরা ছোটরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে সেটা দেখে যুদ্ধকে উপভোগ করব ! কী বিচিত্র এই বালক-মন।

সেই প্রথম সাইরেন শুনলাম। দেখলাম 'বাফার ওয়াল'। যুদ্ধ আমাদের 'বাফার' কথাটা বই না পড়েই শেখাল। অর্থাৎ সংঘর্ষ নিরোধক 'পাঁচিল'।

সেই প্রথম সাইরেন শুনে কী আতঙ্ক আর রোমাঞ্চ মেশানো উপলব্ধি। শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে। আর এখন জন প্রতিনিধিদের গাড়ির আগে পিছে সাইরেন বাজলে বলি শব্দ দূষণ। মন্ত্রী মহোদয়রাও বলেন মাঝে মধ্যে। কারণ

আমার 'কান' আর তাঁদের 'কানে'র কাজ শোনা অর্থাৎ আমারও যা 'মহামান্য' তেনারও তাই।

সমস্ত সরকারী অফিসের সামনে দেওয়াল তোলা হচ্ছে। অর্থাৎ 'বাফার ওয়াল' তৈরি হচ্ছে। ঠিকেদারদের পোয়া বারো। তবে আজকের 'প্রোমোটার'-দের মতো নয়। কোটি কোটির আমদানি। এক আধটা বাড়ি ভেঙ্গে পড়তেই পারে। মানুষ বই তো ভগবান তৈরি করে না। দু-পাঁচ জনের নাম চিত্রগুপ্তের খাতায় তোলা থাকতেই পারে।

বাস্তবে মাঠে-ঘাটে ইংরাজী 'এম' বা 'এল' অক্ষরের আকারে ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছে। অনেক সরকারি বাড়ির সামনে রাজ্যের বালির বস্তার দেওয়াল।

এ. আর. পি. বাহিনী তৈরি হল। আমাদের দাদারা ঘন নীল পোশাক পরে প্যারেড করছেন। আর আমরা যারা ছোট, বড় বড় চোখ করে গর্বের সঙ্গে দেখছি।

কেরানি কুলের সন্তানরা যুদ্ধের দৌলতে হঠাৎই জঙ্গী হয়ে উঠল। আমাদের ভাবনা, কামান-বন্দুক নিয়ে জাপানীদের সঙ্গে ওরা যুদ্ধ করবে। আমরা তাই দেখব, আর দাদাদের সাহায্য করব। কিন্তু যখন জানলাম ওরা যুদ্ধ করবে না, আমরা একটু হতাশ হলাম। তবু উত্তেজনার ঘাটতি নেই আমাদের।

ওদের কাজ ছিল, বিমান আক্রমণের সময়, নাগরিকদের সজাগ করে দেওয়া। কেমন করে আত্মরক্ষা করতে হবে সে কথা জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া। রাস্তার সব আলোয় কালো রং করে টিনের চোঙা পরিয়ে দেওয়া হল, যেন বিমান থেকে নিশানা দেখা না যায়। যে সব বাড়িতে কাঁচের জানালা আছে তার ওপর 'গুণ' চিহ্নের মতো করে খবরের কাগজ ফিতের মতো কেটে লাগিয়ে দেওয়া হল। বোমা পড়ার ঝাঁকুনিতে কাঁচ ভেঙে টুকরো টুকরো না হয়ে যায়।

সন্ধ্যের পর কোন ঘর থেকে আলো বাইরে এসে পড়লে এ. আর. পি-রা সাবধান করে দিত।

আমার মনে আছে ঘরের সব আলোতে কাগজের ঠোঙা কেটে বাল্‌বে পরিয়ে দিয়েছিলাম। গাড়ির হেড্‌লাইটের অর্ধেকটা আলকাতরা দিয়ে ঢাকা থাকত

রাতের পরিবেশ অনেকটা ভুতুড়ে লাগত।

যখন সব দিক দিয়ে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জনের অপেক্ষায়, একদিন বাবা অফিস থেকে ফিরে বললেন, 'আমাদের এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।'

আমাদের বাড়ি বিমান ঘাঁটি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। বিপদের আশঙ্কা আছে তাই আমাদের সংসারকে তিন ভাগ করে তিন জায়গায় পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

এই ব্যবস্থা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। কিন্তু বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কথা বলার সাহস ছিল না।

বাবাকে ছেড়ে থাকা আমার পছন্দ নয়। অফিস করতে হবে তাই একটা ঘরে তিনি একা থাকবেন। অন্য ঘরে এম. ই. এন-এর কর্মীদের মেস হবে। তাছাড়া যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হওয়া।
কী করা যাবে? বাবার সিদ্ধান্ত মানতেই হল। তখন বাবাকে ছেড়ে থাকার কথা ভাবলেই আমার মন ভার হয়ে যেত। বাবাকে যেমন ভয় পেতাম তেমনি ভালবাসতাম। পুরো একটা বছর ছাত্রাবাসে কাটল। মাঝে মধ্যে এক-আধ দিন সেখানে বাবাকে পেলে ছায়ার মতো আগলে রাখতাম। সে যে কী শান্তি বলে বোঝাতে পারব না।

দেখা হলেই বলতাম, 'এখানে আমার একদম ভাল লাগছে না। বাড়ি নিয়ে চল।'□

আত্মজীবনীমূলক লেখকের 'দাঙ্গা, নির্বাসিত জীবন ও মুখের মিছিল' গ্রন্থের অংশবিশেষ। গ্রন্থটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।—সম্পাদক। অঙ্কন: লেখক।

শুভেচ্ছা যোগসূত্রকে

অর্ঘ বসু

ও

অমিতেশ বসু